শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের

অনুধ্যান

PRESENTED

LIBRARY
No. 9/804
Ashram
BANARAS

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

"উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward, onward, (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। Onward, Onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। * * * —'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে।"

— স্বামী বিবেকানন্দ।

ষ
াউস
ত্র ষ্ট্রীট,

PRESENTED

LIBRARY
9/304
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পদানুগ কর্ম্মিগণের

করকমলে

এই পুস্তকখানি সাদরে সমর্পিত

হইল।

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

নিবেদন

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি মহোদয়-গণের আন্তরিক সম্মিলিত চেষ্টা ও সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না ; তাঁহাদের প্রত্যেককেই অন্তরের সহিত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এতদ্ব্যতীত যে সকল সহৃদয় মহোদয়গণের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উৎসাহ লইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল তাঁহাদেরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯৩৭ খৃঃ
৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

বিনীত প্রকাশক—
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থারম্ভ

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪১ সাল।

LIBRARY 9/304
Ramakrishna Ashram
BANARAS

পরিচয়

পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অদ্ভুত জীবনের কথা অনেক দিন বিস্মিতচিত্তে শুনিয়াছি; সর্ব্বাপেক্ষা স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়াছি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ তৈয়ার করিবার অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্যে — যাদুকরী শক্তিতে। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গত ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪১ সাল — ইংরাজী ২২শে অক্টোবর, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই সময় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখিবার মানসে নিজ প্রথানুযায়ী কয়েকদিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতাগুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বাহির হইল।

"জীবে দয়া — জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট — তুই জীবকে দয়া কর্‌বি? দয়া কর্‌বার তুই কে? না, না — জীবে দয়া নয় — শিবজ্ঞানে — জীবের সেবা।" পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে দিন ভাবাবিষ্ট হইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন — সে দিন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেহই উহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারেন নাই। একমাত্র যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান

াদি দিন দেন তো আজ যা শুনলুম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্ব্বত্র প্রচার করবো—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করবো।" পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে এ সকল কথা লিখিয়াছেন। আর নরেন্দ্রনাথ — উত্তরকালে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ—তাহাই করিয়াছিলেন।

বহুকাল অবধি ভারতবর্ষে এক প্রাচীন ভাব চলিয়া আসিতেছিল যে, যে কোনও উপায়ে হউক নিজের মুক্তিলাভ হইলেই হইল। ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত আকাঙ্খায় নানা পন্থা ও নানা প্রকার সাধন অবলম্বিত হইয়াছে। এই সকল পন্থা ও সাধন অবলম্বন করিয়া অনেক সাধক সিদ্ধিলাভ বা মুক্তিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু সমষ্টির উন্নতি বা মুক্তির দিকে কেহই তত দৃষ্টি দেন নাই। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া জাতির মনোভাবের কেন্দ্র অন্যত্র স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। তিনি ব্যক্তিগত মুক্তিকে পিছনে রাখিয়া সমষ্টির মুক্তিকে প্রধান স্থান দিলেন। শ্রীমৎ স্বামিজী বহুস্থানে বহুবার বলিয়াছেন, "এই জগতের দুঃখ দূর কর্ত্তে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয়, তো—তা করব।" "আমি মুক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোকহিতং

চরন্তঃ' (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করেন)— এই আমার ধর্ম্ম।" দরিদ্রকে — আর্ত্তকে 'নারায়ণজ্ঞানে' সেবা স্বামিজীই প্রবর্ত্তন করেন। 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দ তাঁহারই সৃষ্টি। তাঁহার 'নারায়ণজ্ঞানে' সেবার বাণী— যুগবাণী বলিয়া গৃহীত।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে যে সকল যুবক ত্যাগ ও সেবার আদর্শে প্রথমে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন— শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। কিরূপ কঠোরতা, বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা এই নীরব অক্লান্তকর্ম্মী ত্যাগ ও সেবার আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন— কনখলের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহারই এক বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন, "প্রথমে লেখা পড়া বিশেষ কিছু জানিত না, কিন্তু নিজের অদম্য অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরণায় ক্রমে ক্রমে সব কাজ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিল। সেবাশ্রমে যতগুলি বাড়ী হইয়াছে সব সে নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়াছে। ডাক্তারী ক্রমে ক্রমে বেশ শিক্ষা করিয়াছিল। * * অনেক দিন পর্য্যন্ত (মৃত্যু পর্য্যন্ত) ডাক্তারী করিয়া গিয়াছে। হিসাব পত্র ক্রমে ক্রমে সব শিখিয়াছিল। একা ডাক্তারী, হিসাব রক্ষা, বাড়ী প্রস্তুত এবং দেখাশুনা প্রভৃতি সব কাজ করিত। * *

* * * এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত একদিনও ছুটী না লইয়া মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত কাজ করা পৃথিবীর ইতিহাসে কী রূপ? গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা আছে—'মা কর্ম্মফলহেতু র্ভূ র্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি'*—তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত ছিল, তার অভূতপূর্ব্ব চরিত্র। মৃত্যুও তেমনি ধ্যান করিতে করিতে পদ্মাসনে হইয়াছিল।"

পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্ম্মানুষ্ঠান আপন সুতীক্ষ্ণ দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়া অনেক প্রচলিত কিম্ভূৎকিমাকার ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মিগণ জীবনের মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, সচল অগ্নিমেরুর ন্যায় বিচরণ করিয়া দেশ বিদেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব সম্প্রসারণ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন আজ জগতের সর্ব্বত্র একটী বিশেষ শক্তি-বিকিরক কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। নূতন ভারত ও জগতের চিন্তাধারা প্রবর্ত্তনে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান কতটুকু তাহার সম্পূর্ণ বিচার করিবার সময় এখনও উপস্থিত না

---

* তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না অর্থাৎ কর্ম্মফলের জন্য কর্ম্ম করিও না। (আর কর্ম্মফল প্রতিবন্ধক হয়—এই ভয়ে) কর্ম্ম না করাতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়।

হইলেও—একথা অতীব সত্য যে, রামকৃষ্ণ মিশন দেশের ও জগতের নিকট—ধর্ম্মের ও কর্ম্মের এক নূতন আদর্শ ও পন্থা প্রতিভাত করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল কর্ম্মিগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত আদর্শ-পথে চলিতে প্রয়াস পাইয়া ও তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া আসাড় মৃতপ্রায় জাতির জীবনে এক নূতন চেতনা আনিয়া দিয়াছেন—সেই সকল দেবকল্প প্রভঞ্জন-কর্ম্মিগণের অমূল্য জীবনচরিত ও তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ দায়িত্ব দেশবাসী সাধারণের নিশ্চয়ই আছে। সেইজন্য, গ্রন্থকার তাঁহার এই প্রাচীন বয়সে 'শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান' লিখিয়া এবং শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের স্বহস্ত নির্ম্মিত কন্‌খল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত লিখিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুরুগত প্রাণ, একনিষ্ঠ এই মহা কর্ম্মবীরের জীবনী অনুধ্যানে দেশের ও দশের যে প্রভূত কল্যাণ হইবে—তা বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে সুধী পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট নিবেদন এই যে, এই পুস্তক সম্পাদনায় যে ভ্রম ও ত্রুটী রহিয়া গেল তাহা যেন তাঁহারা নিজগুণে মার্জ্জনা করেন।

২০শে মাঘ—১৩৪৩

২৩, ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BHARATIYA

প্রাগ্বাণী

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দলের কর্ম্মীদিগের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাই। পূজ্যপাদ স্বামিজীর নিজ হাতে তৈয়ারী এই সকল নির্ব্বাক কর্ম্মিগণের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, কঠোর নিয়ম-পালন, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রাণস্পর্শী ভালবাসা দিয়াই রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

কথিত আছে পূরাকালে দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়া দেবতাদিগের হিতসাধন করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ মিশনের এই সকল কর্ম্মীরাও ইষ্টকের পরিবর্ত্তে নিজেদের অস্থি-কঙ্কাল দিয়া, চূণসুরকীর পরিবর্ত্তে মজ্জা দিয়া এবং জলের পরিবর্ত্তে হৃদয় ও গাত্রের তপ্ত শোণিত দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যদি নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে স্বামিজী প্রণোদিত এই সকল কর্ম্মিগণ পূরাকালের দধীচি মুনি হইতে কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না। এই সকল কর্ম্মীদিগের প্রত্যেকেরই জীবনী লিখিয়া রাখা আবশ্যক, তাহাতে ভবিষ্যতের কর্ম্মীরা ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উৎসাহিত হইতে পারিবেন। এই বোধেই আমি শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু জানি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি;

কিন্তু আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কর্ম্মিগণেরও জীবনী লিখিত হয়। বার্দ্ধক্যের জন্য আমি নিজে এ বিষয়ে কিছু করিতে অক্ষম। যদি অপর কেহ এই সকল মহান্ ব্যক্তিদিগের জীবনী সম্বন্ধে কিছু লিখেন তাহা হইলে পরম প্রীতিলাভ করিব।

শ্রীমৎ স্বামী কল্যাণানন্দ শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়া আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন; তাহার জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২০শে মাঘ—সন ১৩৪৩

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯৩৭ খৃঃ

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি

৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

বিনীত—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

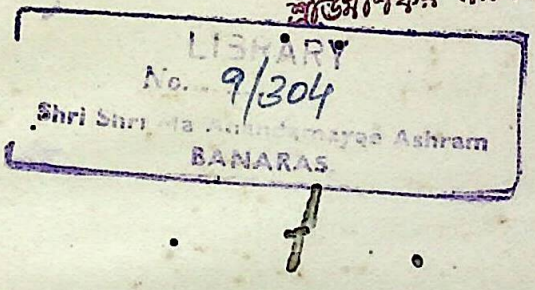

বাণী—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী

নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান

গিরিরাজ হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত কন্‌খলের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। যাঁহারা এই স্থানে গিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী সেবাশ্রম আছে। কন্‌খলের এই রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন; দেহত্যাগ কালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৬৬ হইতে ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দের সম্মিলিত চেষ্টা ও পরিশ্রমে পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে এই মহৎ প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটী দেখিবার ও চিন্তা করিবার বিষয়। এই

জন্য এই কর্ম্মবীর সাধুর কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিতেছি।

আমি বহুবার কন্‌খলে যাইয়া উক্ত সেবাশ্রমে বাস করিয়াছি। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহার দৈনিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই আমার নিকট তাঁহার জীবনের অনেক পূর্ব্বকথা বলিতেন। তাঁহার সকল কথা লিপিবদ্ধ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। অন্যান্য অনেক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের গুটীকতক কথা যাহা আমার ভালো লাগিয়াছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম সুরজ রাও। 'রাওজী' নামে তিনি আমাদিগের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশের দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ কানারায় জন্মগ্রহণ করেন। এই দেশ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের সংলগ্ন — Zanzira (Zanzira) নামক স্থানের সন্নিকট। রাওজী এইজন্য মারাঠী ও মান্দ্রাজী ভাষা বেশ জানিতেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি বাঙ্‌লা ভাষাতেও বেশ কথা

LIBRARY. Ashram BANARAS.

কহিতে পারিতেন; কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষা লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। তিনি জাতিতে ছত্রী (ক্ষত্রিয়) ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার পিতামাতার অপর কয়েকটী পুত্রকন্যাও ছিল; কারণ রাওজী মাঝে মাঝে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা উল্লেখ করিতেন।

বাল্যকালে তিনি কয়েক বৎসর ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারিয়া সিপাহীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন ও সাউথ কর্ণাটিক পল্টনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। এই পল্টন দক্ষিণ প্রদেশের নানা স্থানে ছাউনী করিত। রাওজীও কখনও কখনও ছুটী লইয়া সেখানকার তীর্থাদি দর্শন করিতেন। সাধুভাব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল; কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে তাঁহাকে সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "রামায়ণে উল্লিখিত সরোবর দেখ্‌তে গিছলুম। দেখ্‌লুম দুটী হ্রদ পার্ব্বত্য প্রদেশের মাঝে রয়েছে। একটীর নাম 'পম্পা' ও অপরটীর নাম 'ঋষ্যা'। রামায়ণে উল্লিখিত সব

ঘটনা স্মরণ হওয়ায় হৃদয়ে নানা প্রকার ভাবস্রোত উঠ্‌লো—মস্তিষ্ক আলোড়িত করে স্মৃতি পথে নানা তরঙ্গ প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো। এরূপ আনন্দ জীবনে অল্প সময়েই পেয়েছি।" একদিন তিনি আরও বলিলেন, "দক্ষিণের বড় বড় মন্দির দেখ্‌তে যেতুম। এক একটী মন্দির এক একটী কেল্লা বা নগরের মত।" তিনি আনন্দ করিয়া এই সকল দেশের মন্দিরের বিষয় বর্ণনা করিতেন এবং সেখানকার আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির বিষয়ও বলিতেন। এস্থানে ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে যদিও তিনি বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রখর মেধা থাকায় তিনি দৃষ্ট বিষয় সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেন। তিনি যে সকল বিষয়ের বর্ণনা ও উল্লেখ করিতেন সেই সকল বিষয় আমি অন্যান্য গ্রন্থ ও ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিতাম যে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পর তাঁহার পল্টন বর্ম্মা যুদ্ধে যাত্রা করিল। তিনিও তদনুযায়ী বর্ম্মায় যাইলেন।

যুদ্ধান্তে দ্বন্দ্বের অবহার হইলে তাঁহাকে কিছুকাল বর্ম্মায় থাকিতে হইয়াছিল। তিনি এই সময় 'নায়কের' (Lance-corporal) পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি টেলিগ্রাফ বিভাগে কার্য্য করিতেন। বর্ম্মায় অবস্থানকালে তিনি বৌদ্ধ মন্দিরসকল দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। মন্দিরের পূজা-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, নিবিষ্টমনে নিরীক্ষণ করিতেন। কোন্ স্থানে কি মন্দির গঠিত হইয়াছে সে সকল বিষয় তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রখর মেধা ও প্রবীণতার সহিত বীক্ষণ করিতেন। সেখানে তিনি মাঝে মাঝে বরাহ ও হরিণ ইত্যাদি শীকার করিয়া বেড়াইতেন। জাতিতে ছত্রী থাকায় বরাহ মাংস আহার করা তাঁহাদের প্রথা ছিল।

রাওজী যখন পল্টনের সহিত বর্ম্মায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় একবার তাঁহার খেয়াল হইল যে আন্দামান দ্বীপে জঙ্গলীদের বা ল্যাংটাদের দেখিতে যাইবেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া জাহাজ ও অপরাপর বিষয়ের বন্দোবস্ত

করিয়া কয়েক ঝুড়ি মিঠাই লইয়া জনকতক সঙ্গীসহ আন্দামান দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পর জাহাজ আন্দামান দ্বীপে গিয়া পৌঁছাইল। দ্বীপের পাহাড় জঙ্গলে যে দিকে জঙ্গলীরা বাস করে সেইদিকে একজন দোভাষীর সঙ্গে মিঠাইয়ের ঝুড়িগুলি লইয়া চলিলেন। দোভাষী ল্যাংটাদের বুঝাইয়া দিল যে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাহাদের দেখিতে আসিয়াছে ও তাহাদের জন্য ঝুড়ি করিয়া মিঠাই আনিয়াছে। মিঠাই দেখিয়া তো ল্যাংটারা খুব আমোদ করিল। ল্যাংটারা তাহাদের ধনুকে তীর লাগাইয়া কলা গাছের পাতার গোড়ার দিকে মারিতে লাগিল। ইহাতে গোড়াশুদ্ধ আস্ত কলাপাতা কাটিয়া পড়িল। তারপর কয়েকখানা পাতা মাটিতে পাতিয়া ইসারা করিয়া বলিল, 'এর উপর বস।' পরে আবার ধনুকে তীর লাগাইয়া নারিকেল গাছের কাঁদির গোড়াতে মারিল। কাঁদিটি কাটিয়া নারিকেল শুদ্ধ পড়িতেছে এমন সময় শূন্যপথে কাঁদিটী ধরিয়া ফেলিল। অবশেষে নারিকেলগুলি তীরের

শ্রীভারতী পরিষদ LIBRARY

ফলা দিয়া ছাড়াইয়া খাইতে দিল। রাওজী বলিলেন, "এই জঙ্গলীদের সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে নানারকম কথা হতে লাগ্‌লো। তারা সমুদ্রের তটে সমুদ্রের বড় বড় মাছ ধরে এবং কিনারায় বালির উপর রেখে, পাতা ও কুটীকাটি দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মাছটা পুড়ে গেলে সকলে ঘিরে বসে সেই পোড়া মাছ খেয়ে থাকে এবং হাড়গুলো ফেলে দিয়ে আসে। কারবারীরা হাড়গুলো নিয়ে ব্যবসা করে।"

এইস্থলে ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে তিনি নিজেও লক্ষ্যবেধ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লক্ষ্যবেধে তাঁহার অব্যর্থ সন্ধান ছিল। সৈনিক জীবনে লক্ষ্যবেধ প্রতিযোগিতায় তিনি সর্ব্বদাই উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার হস্তনিক্ষিপ্ত গুলি যে কখনও ব্যর্থ হইত না তাহা আমি নিজেও দেখিয়াছি।

এই সময় তিনি একবার শ্যামদেশে গিয়াছিলেন এবং নিজ স্বভাব অনুযায়ী সেই দেশের রীতি-নীতিও বিশেষভাবে পরিলক্ষ্য করিয়াছিলেন। কয়েক

বৎসর পর তিনি কার্য্যোপলক্ষে একবার জিব্রালটার গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া মাল্টা হইয়া বোম্বাই ফিরিয়া আসেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের পল্টন রায়পুর গমন করিল। রায়পুর মধ্যপ্রদেশের (Central Province) প্রসিদ্ধ সহর। ইংরাজী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্র নাথ দত্ত), আমার ভগিনী ও আমি আমাদের পিতামাতার সহিত রায়পুরে বাস করিয়াছিলাম। শৈশবকালে সেখানে বাস করায় আমার চিত্তে রায়পুরের একটী আনন্দের চিত্র অঙ্কিত আছে। রাওজী এই রায়পুরের মন্দির ও 'বুড়াতলাও'এর কথা আমাকে বলিতেন। আমরা উভয়ে এই কথাবার্ত্তায় বড়ই আনন্দ অনুভব করিতাম।

রাওজীর পল্টন রায়পুরে অবস্থান কালে স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ (নিরঞ্জন মহারাজ) সেই দেশে ছিলেন। ঘটনাক্রমে রাওজীর সহিত নিরঞ্জন মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতই হইল তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তনের

বিশেষ কারণ। স্বামী নিরাঞ্জনানন্দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া রাওজীর স্বভাবসিদ্ধ তীব্র বৈরাগ্যের ভাবটী আরও অধিক ফুটিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও স্বামী বিবেকানন্দের কথা তিনি নিবিষ্টমনে শুনিতেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন মান্দ্রাজে আসেন রাওজী তাঁহাকে একবার দেখিয়াছিলেন। এই সময়কার অনেক কথা তিনি আমাকে বলিতেন।

স্বামীজীর সহিত রাওজীর মান্দ্রাজে প্রথম দর্শন। সেই সময়ে রাওজী মান্দ্রাজ সহরের অনতিদূরে একটী গ্রামে বাস করিতেন। পূজ্যপাদ স্বামিজী প্রথম বার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিংহল, মাদুরা, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক মান্দ্রাজ অভিমুখে আগমন করিতেছেন এই সংবাদ পূর্ব্বেই গ্রামবাসীদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। আর পাশ্চাত্য দেশে স্বামিজীর সুখ্যাতি ও কার্য্যবিবরণীর কথাও কেহই অবিদিত ছিলেন না। রাওজী সেই সময় প্রত্যহ সংবাদপত্রাদি হইতে স্বামিজীর সংবাদ পাঠ করিতেন। স্বামিজী কুম্ভ-

কোণম্ হইতে স্পেশাল ট্রেণে করিয়া মান্দ্রাজে আসিবেন, মধ্যে অন্য কোথাও থামিবেন না একথা রাওজীর ও তাঁহার গ্রামবাসী কাহারও অবিদিত রহিল না। তথাপি শত শত লোক ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন এবং স্বামিজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গাড়ী থামাইতে ব্রতী হইয়াছিলেন। রাওজী এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। যাহাতে গাড়ী পাঁচ মিনিট কাল ষ্টেশনে দাঁড়ায় সেজন্য ষ্টেশন মাষ্টারকে তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করেন ; কিন্তু তিনি সে অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাওজী প্রমুখ গ্রামবাসিগণ জীবন পণ করিয়া গাড়ী আসিবার কালে রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িলেন। দূর হইতে গার্ড রেল লাইনের উপর বহুলোক দেখিয়া বিপদ বুঝিয়া গাড়ী থামাইয়া দিলেন। স্বামিজীর ভাবী শিষ্য গুরুগত প্রাণ রাওজীর গুরু দর্শনের জন্য প্রবল আগ্রহ পরমেশ্বর এইরূপে পূর্ণ করিলেন। স্বামিজী গাড়ী হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া ও কয়েকটী উপদেশের দ্বারা সকলকে আনন্দিত করিলেন।

রাওজীর কিন্তু সে সময় স্বামিজীকে ক্ষণিক দর্শনে তৃপ্তি হইল না। তিনি আর না বাড়ী ফিরিয়া সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে মান্দ্রাজ অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজের পথে সমুদ্রতীরে জেলেরা গৃহে গৃহে প্রদীপশ্রেণী সাজাইয়া দিয়া আনন্দ করিতেছে দেখিয়া রাওজী কয়েকটী বালককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল, "ক্যায়া জান্‌তা নহী জগদ্‌গুরু আ গিয়া?" তিনি বুঝিলেন যে সে স্থানের অশিক্ষিত জেলেরা পর্য্যন্ত স্বামিজীর পাশ্চাত্য দেশ জয় করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকে জগদ্‌গুরুর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। মান্দ্রাজ সহরের রাস্তাঘাট তাঁহার ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে জানা ছিল না, তাহার পর আবার রাত্রি হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত পথ দিয়া স্বামিজীর নাম স্মরণ করিতে করিতে তিনি চলিলেন। হঠাৎ জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে তিনি সহর হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণ পথ হাঁটায়

বিশেষ শ্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে একটী পুষ্করিণীর পাকা ঘাটের উপর নিজের গামছাটী বিছাইয়া তদুপরি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তৎপরে সেখান হইতে হাঁটিয়া বেলা সাতটার সময় মান্দ্রাজস্থ 'ক্যাস্‌ল কার্ণান' (Castle Kernan) ভবনের দ্বারে পৌঁছাইলেন। পূজ্যপাদ স্বামিজী এই ভবনেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে বহুলোক সমবেত ছিলেন। রাওজীর কাছে শুনিয়াছি—সাতটার সময় তিনি দ্বারে পৌঁছাইয়াছিলেন—আর স্বামিজীর কাছে তাঁহার উপস্থিত হইতে বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল। তিনি পরম সহিষ্ণুতার সহিত এই পাঁচ ঘণ্টা কাল স্বামিজীর দর্শনের আশায় এই মহতী জনতার মধ্যে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর নিকট পৌঁছাইয়া কিছু না বলিয়া তাঁহার পদতলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যখন সকল লোক চলিয়া গিয়াছে—স্বামিজীর দৃষ্টি হঠাৎ তাঁহার উপর পড়িল। রাওজী স্বামিজীকে প্রণাম করিলেন। স্বামিজী 'কোথা হইতে আসিয়াছ, আহারাদি হইয়াছে কিনা' ইত্যাদি

সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কেন আসিয়াছেন ও আহারাদি হয় নাই, ইত্যাদি সকল কথা বলিলেন। তখন স্বামিজী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক সাধুকে আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। রাওজী তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সুস্থ হইলেন এবং পরে আর সংসারে না ফিরিয়া তাঁহার সহিত কলিকাতায় যাইবেন ও সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু স্বামিজী তখন কিছুতেই তাঁহাকে লইতে রাজী হইলেন না। "পরে আমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা কোরো" এই কথা বলিলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। স্বামিজীর কথানুযায়ী তিনি পরে তাঁহার সহিত বেলুড় মঠে দেখা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক রায়পুরে থাকার কালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের বাক্যালাপ শুনিয়া তাঁহার সন্ন্যাস লইবার প্রবল ইচ্ছা পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন যে পল্টনের বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এইজন্য তিনি

পাগলের ভাণ করিলেন। পল্টনের ডাক্তার তাঁহার মস্তকে দৈনিক আধ মণ হইতে এক মণ পর্য্যন্ত বরফ বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। এ সকলই তিনি সহ্য করিতেন এবং পরে আবার পাগলামী আরম্ভ করিতেন। সেয়ান পাগলের সহিত্ কে আর কি করিতে পারিবে? অবশেষে পল্টন হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা হইল। তিনিও তাঁহার পুঁটলী পোঁটলা সমেত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কলিকাতায় তিনি একেবারে বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শরীর তখন অসুস্থ। তিনি আহার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি যাইয়া সংবাদ দিল যে একটী মারাঠী যুবক তাঁহার দর্শন অভিলাষে আসিয়াছে। স্বামিজী আদেশ করিলেন, "যুবকটীকে স্নান আহার কর্‌তে বল। আমি বিশ্রাম করে পরে তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব।" এই সংবাদ জানান হইলে যুবকটী বলিল, "আমি স্বামিজীকে প্রণাম না করে স্নান আহার কর্‌বো না। আমি অনেক দূরদেশ হতে স্বামিজীকে দর্শন কর্‌তে এসেছি—স্নান আহারের

শ্রীউমাশঙ্কর সমাদ্দার

প্রত্যাশী নই।" এইরূপ দৃঢ়চিত্ত ভাবের কথা শুনিয়া স্বামিজী নীচে নামিয়া আসিলেন। রাওজী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; তাহার পর স্নান আহারের উদ্যোগ করিলেন।

এই সময় হইতে রাওজী মঠে বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী রাওজীর কার্য্যকলাপ, মনোবৃত্তি ও হাব ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম দিলেন 'নিশ্চয়ানন্দ'। ইংরাজীতে যাহাকে Certitude, Affirmative, Resolute বলে—তাঁহার মনোভাব ও কার্য্যকলাপ ঠিক সেইরূপই ছিল। সেইজন্য স্বামিজী তাঁহার নাম দিয়াছিলেন—'নিশ্চয়ানন্দ'। মঠে অবস্থান কালে তিনি স্বামিজীর সেবা করিতেন ও ঠাকুর ঘরের কার্য্য করিতেন।

স্বামিজীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করায় তিনি স্বামিজীর বিশেষ ঘনিষ্ঠসঙ্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই জন্যই স্বামিজীর জীবনের অনেক ঘটনার বিষয় তাঁহার বিশেষরূপে জানা ছিল।

এস্থলে দুই একটী ঘটনা যাহা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম উল্লেখ করিতেছি।

নিশ্চয়ানন্দ একদিন বলিলেন, "আর্য্যসমাজের কতকগুলি লোক স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে আসেন। তাঁরা ভাব-গতিকে এরূপ প্রকাশ কর্‌লেন যে তাঁরা স্বামিজীকে আর্য্যসমাজের নেতা কর্‌তে পারেন যদি স্বামিজী বিগ্রহ পূজা পরিত্যাগ করেন; কিন্তু বিগ্রহের কি ব্যাখ্যা স্বামিজী তা তাঁদের ধীর ও নম্র ভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং ব'ললেন,—'যদি দেশের কুশলের জন্য এতটাই কষ্ট স্বীকার কর্‌তে পারেন সামান্য একটু পাথরেই আটকে যাচ্ছে? একটু পাথর, একটু মাটী, এত বিড়ম্বনা হয়ে উঠ্‌লো? নিম্ন অবস্থায় বা প্রাথমিক অবস্থায় প্রতীকের আবশ্যক, তা ভিন্ন সাধারণ লোক ভগবানের চিন্তা কর্‌তে পারে না। উচ্চাবস্থায় উঠ্‌লে ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান হ'লে প্রতীকের কোন চিন্তা থাক্‌তে পারে না—সে সময় বাহ্যিক প্রতীকের কোন আবশ্যকও হয় না। সাধারণ লোক তো অদ্বৈতবাদী হ'তে পারে না, এইজন্য প্রথম অবস্থায়

প্রতীকের দরকার আছে।' কিন্তু আর্য্যসমাজের লোকেরা প্রতীক বা বিগ্রহের প্রতি নানারূপ কটাক্ষ করে কথা বল্‌তে লাগলেন। স্বামিজী বললেন,—'আমি আর্য্যসমাজ ভুক্ত হ'তে ইচ্ছা করি না। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত—সমস্ত জীবনই সেই রকম থাক্‌বো।' শেষে আর্য্যসমাজীরা চলে গেলেন।"

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ আর একদিন বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত জাপানী মঠে এসেছিলেন। 'ওকাকুরা' নামে এক প্রসিদ্ধ জাপানী ভদ্রলোক মঠে থাক্‌তেন এবং 'হরিনটকী' নামে আর একজন জাপানী যুবকও কিছুদিন মঠে ছিলেন। এইজন্য অনেক সম্ভ্রান্ত জাপানী মঠে থাক্‌তেন বা যাতায়াত কর্‌তেন। জাপান সরকার হ'তে এরূপ কথাবার্ত্তা হয় যে, তাঁরা একটা ধর্ম্মসভা কর্‌বেন, স্বামিজী সেই ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষতা কর্‌বেন। স্বামিজীর যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় জাপান সরকার বহন ক'র্‌বেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ থাকায় সভার সময় নির্দ্ধারিত হয়নি। একদিন কয়েকজন বিশিষ্ট

জাপানী স্বামিজীর কাছে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে, সমস্ত আয় ব্যতীত আরও অর্থ তাঁরা স্বামিজীকে দেবেন, কিন্তু জাপান সরকারের নির্দ্দেশ মত তাঁকে কাজ ক'র্‌তে হবে। অপরের আদেশ অনুযায়ী কাজ ক'র্‌তে হবে শুনে স্বামিজী বিরক্ত হ'লেন এবং আমাকে ডেকে বল্লেন—'টাকার বাস্কটাকে জলে ফেলে দে, আমি যাব না, আমি জাপানীদের সঙ্গে সংশ্রব রাখ্‌বো না। কি উচিত, কি অনুচিত আমি জানি না! আমাকে লোভ দেখায়, আমাকে টাকা দিয়ে কিন্‌তে চায়। বিবেকানন্দ কি বাজারের জিনিষ যে টাকা দিয়ে কিন্‌তে পারা যায়?'"

আর একদিন অপরাহ্ণে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, "এক বছর কল্‌কাতায় কংগ্রেস হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে লোকমান্য তিলক কল্‌কাতায় এসেছিলেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর সঙ্গে সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ করা নিষেধ ছিল। এইজন্য সাধারণ আগন্তুক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হ'ত না। তিলক একদিন

9/804

অপরাহ্নে নৌকা করে এসে মঠের দক্ষিণ অংশে বেলতলার দিকে নৌকা লাগিয়ে উঠ্‌লেন এবং নিজের নাম লেখা একখানা কার্ড একটী বৃদ্ধ সাধুকে দিলেন, যাতে স্বামিজী শীঘ্র তাঁর আসবার খবর পান। বৃদ্ধ সাধুটীর বিবেচনা শক্তি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ একটু ভিন্ন প্রকারের ছিল। তিলক মাঠে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধ সাধুটী মঠ-বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরে তিলককে বল্‌লেন, 'স্বামিজীর শরীর অসুস্থ, তিনি এখন সাক্ষাৎ কর্‌বেন না।' তিলক অতি বিনীত ভাবে বল্‌লেন, 'আচ্ছা, স্বামিজীকে সময়মত কার্ডখানি দেবেন।' এই বলে তিনি নৌকা করে চলে গেলেন।"

"সন্ধ্যার পর স্বামিজী নীচে নাম্‌লে বৃদ্ধ সাধুটী তাঁকে কার্ডখানি দিলেন। স্বামিজী কার্ডে তিলকের নাম দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তিলক কোথায়?' বৃদ্ধ সাধুটী বল্‌লেন, 'সে ব্যক্তি অপরাহ্নে এসেছিলেন, এখন চলে গেছেন।' স্বামিজী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং নানা প্রকার ভৎর্সনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে আমাকে বল্‌তে লাগলেন, 'তুই

তো মারাঠী, তুই তো তিলককে জানিস্, তুই কেন আমাকে খবর দিস্‌নি?' তারপর স্বামিজী নিজের হাতে তখনি তিলককে একখানি পত্র দিলেন এবং সেই বৃদ্ধ সাধুটীকে আদেশ কর্‌লেন, 'তোমার শাস্তিস্বরূপ এই চিঠি নিয়ে হাওড়া গিয়ে ডাক ঘরে দিয়ে আসতে হবে।" স্বামিজী মহাক্রুদ্ধ হয়েছেন। আদেশ পালন কর্‌তেই হবে। বৃদ্ধ সাধুটী একটী লণ্ঠন নিয়ে এঁকে ওকে ডাক্‌তে লাগলেন—যদি কেহ সঙ্গে যান। স্বামিজী বল্‌লেন, 'কেউ সঙ্গে যাবে না, তোমাকে একলাই যেতে হবে। তুমি অতি গর্হিত কাজ করেছ।' বৃদ্ধ সাধুটী অনন্যোপায় হয়ে হাওড়ায় গিয়ে ডাকে চিঠিটী ফেলে এলেন। তিলক পত্র পেয়ে দু'এক দিনের ভেতর মঠে এলেন। মঠবাড়ীর দক্ষিণ দিকের মাঠে পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে স্বামিজীর সঙ্গে নানা প্রকার কথা কইতে লাগলেন। সেখানে কারও যাওয়ার আদেশ ছিল না। দূর হতে আকার ইঙ্গিতে বুঝা গেল যে স্বামিজী উত্তেজিত হয়ে মাথা ও হাত নেড়ে কথা কইছেন, আর তিলক ধীর ও শান্ত ভাবে সেই সকল

কথা শুনছেন; কিন্তু কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা আমরা কেহই বিশেষ কিছু জানি না।"

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, "তিলক আগে শুধু মারাঠা দেশের ব্রাহ্মণদের জন্য নানা প্রচেষ্টা কর্‌ছিলেন। স্বামিজী বুঝিয়ে দিলেন যে একটা জাতিকে তুল্‌তে হ'লে জাতের মাত্র এক অংশকে তুল্‌লে হবে না। গরীব, দুঃখী, নিম্নশ্রেণীর সকলকেও না তুল্‌লে জাত উঠ্‌বে না। স্বামিজীর সংস্পর্শে আসা অবধি তিলকের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হ'ল। তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যও নানাপ্রকার প্রচেষ্টা কর্‌তে লাগলেন।" স্বামিজীর সংস্পর্শে আসা অবধি লোকমান্য তিলকের মনোভাবের যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এই কথা স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বারংবার বলিতে লাগিলেন। যাহা হউক তিলক মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন এবং স্বামিজীর সহিত তাঁহার নানা বিষয়ের আলোচনা হইত।

লোকমান্য তিলক যে মঠে আসিয়া ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিতেন তাহা একটী ঘটনা হইতে

বিশেষরূপে বুঝা যায়। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের নিকট শুনিয়াছি যে একদিন অপরাহ্নে তিলক আসিয়া 'মোগলাই চা' তৈয়ার করিলেন। জায় ফল, জয়ত্রী, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, জাফরান ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য দিয়া একটা সিদ্ধজলের কাথ্ তৈয়ার করিলেন এবং সেই সিদ্ধ জলের কাথে চা, দুধ ও চিনি দিয়া 'মোগলাই চা' করিলেন। এক হাণ্ডা চা হইয়াছিল। তিলক বলিলেন, "একবাটী করে চা খাবেন, বেশী খাবেন না।" চা পান করিতে সুস্বাদু হইয়াছিল। এইজন্য অনেকেই দুই তিন বাটী খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন "হাণ্ডা শুদ্ধ চা তো রইল, পরে দরকার হয়তো খাবেন।" চা এত উগ্র হইয়াছিল যে যত সময় যাইতে লাগিল ততই শরীরের ভিতর উষ্ণতা প্রবল হইতে লাগিল। দ্বিতীয়বার চা পান করিতে কাহারও ইচ্ছা রহিল না। লোকমান্য তিলকের কথা বলিতে বলিতে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন।

আমি এক এক দিন ইতিহাস হইতে শিবাজীর

কথা বলিতাম। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সাধু হইলেও জাতিতে মহারাষ্ট্রীয়। শিবাজীর কথা শুনিতে শুনিতেও তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন এবং আমাকে শিবাজী সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি যে শিবাজীই হইতেছেন মহারাষ্ট্র জাতির আদর্শ। ছত্রপতি শিবাজীর কথা উল্লেখ করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং তখন তিনি যেন আর সাধু নহেন—শিবাজীর একজন সৈনিক হইয়া গিয়াছেন, এইরূপ বলিয়া বোধ হইত। মহারাষ্ট্র দেশের কোন্‌খানে কি আছে তাহা সমস্তই তখন তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া যাইতেন। দেখিয়াছি, মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসের সকল খুঁটিনাটিই তাঁহার জানা ছিল। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওয়াণ্ডি ওয়াস (Wandi-Wash) কোন্ দেশটাকে বলে?" স্বামী নিশ্চয়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ওরূপ উচ্চারণ নয়, ওটা হলো 'বন্দীবাস'। একটা বিশেষ প্রদেশ ছিল যেখানে বন্দীদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'তো।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মারাঠীদিগকে

'বর্গী' বলে কেন?" তিনি বলিলেন, "বর্গী হ'ল 'বাহির গীর' অর্থাৎ গ্রামের বাইরে যারা থাকে। তারা এক রকম বুনো জাত। যুদ্ধের সময় তারা শিবাজীর সৈন্যদলভুক্ত হ'তো এবং নানাপ্রকার নির্য্যাতন ক'রে আক্রমিত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রতো। যুদ্ধের অবসান হ'লে তারা আবার গ্রামের প্রান্তে গিয়ে বাস কর্‌তো।"

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, যে আদেশটী তাঁহাকে প্রথমে দেওয়া হইত তাহা সমাপন না করিয়া তিনি অপর আদেশ শুনিতেন না বা অপর কার্য্যে হাত দিতেন না। তিনি কোন কার্য্যই অর্দ্ধসমাপ্ত ভাবে ফেলিয়া রাখিতেন না। একটী কার্য্য সমাপন করিয়া তবে অপর কার্য্যে হাত দিতেন। বোধ হয়, ইহা তাঁহার পূর্ব্বজীবনের সামরিক শিক্ষা লাভের ফল। কোন কার্য্য অর্দ্ধ সমাপন করিয়া অন্য কার্য্যে হাত দেওয়া অতি দূষণীয়, কেননা তাহা হইলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহার সারা জীবনেই এই ভাব

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

অনুসরণ করিয়াছিলেন ; আর বোধ হয় এইজন্যই তিনি সকল কার্য্যই নিখুঁত ভাবে করিতে সমর্থ হইতেন। প্রকৃতপক্ষে যাহাকে বলে—"Thorough in any work"—সর্ব্বকার্য্যেই নিখুঁত——তাঁহার কার্য্যের ধারা তাহাই ছিল। কার্য্য ছোট কি বড়—তাঁহার কাছে এ সকল প্রভেদ ছিল না ; সকল কার্য্যই তিনি মন-প্রাণ দিয়া করিতেন।

রাওজীর গুরুভক্তি ও কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে একটী ঘটনা যাহা আমি শুনিয়াছি তাহার উল্লেখ করিতেছি। একবার কলিকাতার নিকট 'আড়িয়াদহ' নিবাসী জনৈক গোয়ালার নিকট স্বামিজীর জন্য একটী দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা হয়। পূজ্যপাদ স্বামিজী—স্বামী নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ (কানাই মহারাজ) ও মঠের অপর জনৈক সাধুকে সেই গরুটী আনিতে পাঠাইয়া ছিলেন। গরুটী ক্রয় করিয়া আনিবার কালে তথা হইতে মঠে আসিবার রাস্তায় গঙ্গা অতিক্রম করিতে হয়। তাঁহারা সকলে গরু ও বাছুরের সহিত নৌকায় উঠিলেন। তখন বর্ষাকাল, মা গঙ্গা ভীষণ

বেগবতী। গঙ্গার ধারা একটানায় প্রবলবেগে বহিতেছে। নৌকাটী মাঝ-গঙ্গায় আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ উহা ভীষণ ভাবে দুলিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই গরুটী ভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গুরুবাক্য স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইহাতে সকলে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ জল ছিটাইয়া গরুর মুখটী কিনারার দিকে করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি গরুটীর সহিত স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। অতঃপর গরুটী লইয়া বহু কষ্টে পূর্ব্বকূল হইতে পশ্চিমকূলে আসিলেন; কিন্তু কিনারায় এত কাদা যে সেখানে গরুটী তোলা বড়ই দুঃসাধ্য। তিনি নিজে অতি কষ্টে উঠিলেন, কিন্তু গরু আর উঠে না। ইহাতে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে স্থানে কয়েকটী ভাঙ্গা নৌকার কাঠ পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়া তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া গরুটীর

শ্রীউমাশঙ্কর দাশগুপ্ত

পায়ের নীচে দিয়া অতি কষ্টে উহাকে ডাঙ্গায় উঠাইয়া মঠে লইয়া যাইলেন। মঠে পৌঁছাইতে সকলে তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গরু লইয়া আসিয়াছেন ক্রমে এই কথা স্বামিজীর কাছে পৌঁছাইল। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তথায় উপস্থিত হইলে গরুটীর জন্য তিনি মূর্খের মত নিজের জীবনটা কেন দিতে গিয়াছিলেন স্বামিজী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে গরু আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন, গরুটী ছেড়ে কেমন করে আসি?" একথায় স্বামিজী বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন "ঠিক্ ঠিক্! আমি গরু আন্‌তে বলেছি, তুমি কেন তাকে ফেলে আস্‌বে!"

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই স্বামিজী দেহত্যাগ করেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ স্থির করিলেন যে তিনি বেলুড় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, তাঁহার আর মঠে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। একদিন বৈকাল বেলা স্বামী সারদানন্দ, অপর কয়েকজন

ব্যক্তি ও আমি মাঠের দিকের রিক্‌টীতে বসিয়া আছি —সকলই শোকার্ত্ত। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সেখানে আসিয়া বসিলেন। একটু পরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমি যাঁর সম্পর্কে এখানে এসেছিলুম তিনি যখন চলে গেছেন—তখন আমি আর এখানে থাক্‌বো না। আমি নিশ্চয় চলে যাবো। যেখানে মন যায় সেখানে গিয়ে থাক্‌বো।" স্বামী সারদানন্দ অনেক অনুরোধ করিয়া বুঝাইলেন যে, তিনি সহসা চলিয়া যাইলে লোকে অন্য রকম ভাবিবে। তিনি অনুরোধ করিলেন যেন স্বামী নিশ্চয়ানন্দ অন্ততঃ একমাস কাল মঠে থাকিয়া পরে অন্যত্র গমন করেন। এইরূপ অনেক কথার পর স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাত সময় পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মঠে অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠে বাস ত্যাগ করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিবার পর স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কুম্ভমেলার সময় অবশেষে কন্‌খলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে 'রমতা' সাধুর ন্যায় কিছু দিন ছিলেন। একদিন তাঁহার সহিত অপর

একটী যুবক সাধুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন যে তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য—বৎসরাধিক পূর্ব্বে বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন এবং কন্‌খলের বাজারের নিকট একটী ভাড়াটিয়া ঘরে ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা নিরাশ্রয় সাধুগণের সেবায় নিযুক্ত আছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক এবং উভয়ে গুরুভ্রাতা হওয়ায় এখন হইতে তাঁহারা একত্র বাস করিতে লাগিলেন। এই নূতন যুবকটীর নাম স্বামী কল্যাণানন্দ। ইনি বেলুড় মঠের নির্দ্দেশে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে কন্‌খলে আসিয়া অসুস্থ সাধুগণের সেবার নিমিত্ত ক্ষুদ্রাকারে ভাড়াটিয়া বাটীতে সেবাকার্য্য আরম্ভ করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কেদার-বদ্রীর রাস্তা হইতে ফিরিয়া পূজ্যপাদ স্বামিজী, গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত তপস্যা করিবার জন্য দ্বিতীয়বার হৃষীকেশে আগমন করেন। তাঁহারা সেই বার চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট একটী কুঁড়ে ঘরে বাস করিতেন এবং পবিত্র মাধুকরী ভিক্ষান্নে দিন

যাপন করিয়া কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে স্বামিজী ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হয়। স্বামিজীর জীবনের আশা রহিল না। তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। কিন্তু এ অঞ্চলে চিকিৎসক ও ঔষধ পথ্যের অত্যন্ত অভাব। তজ্জন্য তাঁহার যথোপযুক্ত চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া গুরুভ্রাতাগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন, এমন সময় একটী সাধু আসিয়া মধুসহ কিছু পিপুল চূর্ণ তাঁহার জিহ্বায় প্রদান করিতে থাকিলে বহুক্ষণ পরে স্বামিজীর সংজ্ঞা আনয়নে সমর্থ হইলেন। অতঃপর তাঁহারা স্বামিজীকে লইয়া হরিদ্বারে গমন করিলেন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন কন্‌খলে তপস্যা করিতে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনিও হরিদ্বারে আসিলেন। তাঁহাদের সমবেত শুশ্রূষায় তিনি সুস্থ হইলেন। এইরূপে সেইবার স্বামিজীর জীবন রক্ষা হইল। পূজ্যপাদ স্বামিজী পরে স্বামী কল্যাণানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যগণকে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, কন্‌খল প্রভৃতি তপস্যানুকূল

স্থানে সাধুগণ তপস্যা করিতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলে কিরূপে বিনা চিকিৎসায় জীবন হারাইয়া থাকেন, ইত্যাদি বলিয়া ঐ সব স্থানে সেবাশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামিজীর এই মহতী ইচ্ছা হৃদয়ে ধারণ করিয়া হরিদ্বার অঞ্চলে যাত্রা করেন এবং পীড়িত সাধুগণকে শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদি দ্বারা সেবা করিবার জন্য কন্‌খলে ক্ষুদ্রাকারে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

আমি যখন কন্‌খলে ছিলাম স্বামী নিশ্চয়ানন্দ একদিন অপরাহ্নে অবসর পাইয়া অতি আনন্দের সহিত আমাকে তাঁহার সাধু-জীবনের নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলিয়াছিলেন, "একদিন সন্ধ্যার সময় স্বামিজী নিজের ঘরে বসে আছেন, ঘরে অপর কেউ নাই। স্বামিজী আমাকে ডেকে বল্‌তে লাগলেন,—'দেখ, নিশ্চয়! সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। কোনও ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ কর্‌লে প্রতিদান দিতে হয়। সাধু-সমাজ অন্যের অন্ন খেয়ে জড় হয়ে গেছে। সমস্ত দেশটা অপরের

উপর নির্ভর করে জড়বৎ হয়ে গেছে। এতে দেশের উন্নতি না হয়ে অবনতি হয়েছে। তুমি কখনও এরূপ কাজ কোরো না। যদি বড় কাজ কিছু না কর্‌তে পার—অন্ততঃ এক পয়সায় একটি মাটির কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে থেকে তৃষ্ণাতুর পথিকদের জলপান করাবে—তাতেও কিছু কাজ হবে। নিষ্ক্রিয় হয়ে অপরের অন্ন খাওয়া অতি দূষণীয়।' "

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কর্ম্মপ্রিয় ও তেজস্বী। স্বামিজীর এই বাণী তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল এবং তাঁহার প্রাণ এক নূতন ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই বাণীই হইল তাঁহার দীক্ষা—তাঁহার সমস্ত পরবর্ত্তী জীবনে ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামিজীর এই একটী বাণী, এই একটী আদেশ তাঁহার সমস্ত জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল। স্বামিজী নিভৃতে তাঁহাকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই কথাটী যে তাঁহার বীজমন্ত্র-স্বরূপ হইয়াছিল তাহা তিনি আনন্দ করিয়া বহুবার আমাকে বলিয়াছিলেন।

কন্‌খলের প্রাচীন নাম—'মায়াপুর'। এইস্থানকে মহাভারতে 'কুরু জাঙ্গল' বলিত। হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানকে 'গঙ্গাদ্বার' বলিত। এখানে 'ব্রহ্মকুণ্ড' বা 'কুশাবর্ত্ত' ঘাট প্রসিদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও গান্ধারী এই 'কুশাবর্ত্তে' দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কেবলমাত্র সঞ্জয় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থান মহাতীর্থ। এই মহাতীর্থেই এই যুবক দুইটী সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

পূর্ব্বের ভাড়াটিয়া বাটী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সেখপুরা মহল্লাতে সামান্য জমী ক্রয় করিয়া পীড়িত সাধুদের সেবার জন্য তিনটী চালাঘর করিলেন। একটী চালাঘরে সাধারণ রোগী ও ঔষধাদি থাকিত এবং তাঁহারা নিজেরাও সেই ঘরে শয়ন করিতেন। দ্বিতীয় ঘরটীতে সাধু রোগী থাকিত, তৃতীয় ঘরটীতে রন্ধনাদি কার্য্য হইত। তাঁহারা আগন্তুক যাত্রীদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিয়া ঔষধ এবং রোগীর পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন; আর নিজেরা ছত্রে গিয়া খাইয়া

আসিতেন। উভয়ে রোগীদের মলমূত্র পরিষ্কার ও নানাপ্রকার সেবা করিতেন। রোগী গতাসু হইলে একটি মাচার উপর স্থাপন করিয়া নগ্নপদে প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত উপলখণ্ডের উপর হোঁচোট খাইতে খাইতে নীলধারে বা গঙ্গায় যেখানে স্রোত থাকিত সেইখানে শবটীকে ভাসাইয়া দিয়া আসিতেন। তাঁহারা কখনও নিজেদের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। অতি কঠোর সেবার ভাব তাঁহাদের মনে প্রদীপ্ত হইয়াছিল এবং তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অতিমানুষিক কঠোর তপস্যা তাঁহারা করিতে লাগিলেন। কন্‌খলে অবস্থান কালে পরবর্ত্তী সময়েও দেখিয়াছি—অভিমানশূন্য, প্রাধান্যস্পৃহাশূন্য, বিলাসিতার রেখা মাত্র বর্জ্জিত, জীর্ণ পরিধান ও ছিন্ন পাদুকাতেই তৃপ্ত হইয়া ইহারা দিন যাপন করিতেছেন। প্রথম অবস্থায় যেমন সর্ব্বস্বত্যাগী, সেবাপরায়ণ সাধুভাব —শেষ অবস্থাতেও সেইরূপ। এই সেবারূপ তপস্যায় তাঁহারা সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা এই নবভাবে অনুপ্রাণিত সাধুদের সেবা-কার্য্য পুরাতনপন্থী সাধুমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। আজও অনেক সাধু রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের "মশিন্ সাধু" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন—অর্থাৎ "মশিন্ সাধুরা" (মিশনের সাধুরা) জাত বিচার না করিয়া সাধারণের সেবা করেন—এইজন্য এই সাধুদের কটু উক্তি। অধুনা কিন্তু মিশনের সাধুদের প্রতি অন্য অনেক সাধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখা যায়। এখনকার বিশিষ্ট সাধুগণ অসুস্থ অবস্থায় সেবাশ্রমে আসিয়া ইঁহাদের আন্তরিক ও সযত্ন সেবা গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মিশনের এই সব নিষ্কাম সেবক সাধুগণ কেবলমাত্র 'শিবজ্ঞানে' জীবসেবায় ব্রতী। সাধারণ হাঁসপাতালের ন্যায় তাঁহাদের কোনও সাংসারিক বুদ্ধি নাই।

এইরূপে সাধুমণ্ডলী ও যাত্রীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে এই মহান্ প্রতিষ্ঠান পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে শির উত্তোলন করিয়া স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। গুরুর স্মৃতি তাঁহারই আদিষ্ট

জীবসেবা দ্বারা রক্ষা করিয়া কর্ম্মে কি অদ্ভুত নিষ্ঠাই না তাঁহারা দেখাইয়াছেন। স্বামিজীর দেহান্তকাল হইতে একনিষ্ঠ সেবাব্রতধারী স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বাঙ্গালা দেশে আর কদাপি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। স্বামী তুরীয়ানন্দের (হরি মহারাজ) অসুখের সময় একবার মাত্র কাশী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন—আর একবার তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য উত্তর কাশীতে গিয়াছিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবার মাত্র কন্‌খল ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় আসিয়াছিলেন—তাহাও সেবাকার্য্য করিবার জন্য। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, এই বীর কর্ম্মিদ্বয় একদিকে যেমন সেবা-কর্ম্মে নিজেদের নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—অপরদিকে তেমনি জপ-ধ্যানও করিতেন। তাঁহারা যেন দুই হস্তে দুইখানি অসি চালনা করিতেন। সেবা-কার্য্য যেমন ছিল—সাধন-ভজনও তেমন ছিল। কন্‌খলে অবস্থান কালে আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কর্ম্মী হইলেও তাঁহার ভিতর প্রগাঢ় ধ্যানের ভাব ছিল; বোধ হয় এই জন্যই

মহাতপা পূজনীয় হরি মহারাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। পূজনীয় হরি মহারাজ হিমালয়ের উত্তর কাশী নামক একটী একান্ত নির্জ্জন স্থানে একবার তপস্যা করিবার নিমিত্ত যান। সেই সময় স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কন্‌খল সেবাশ্রমের অন্যতম কর্ম্মী। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মনে হঠাৎ সেই মহাপুরুষের সৎসঙ্গ লাভ, তাঁহার সেবা ও তপস্যাদি করিবার প্রবল বাসনা জাগরিত হইল। তিনি একাকী নিবিড় বনসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যায় উত্তর কাশীতে হরি মহারাজের 'কুটিয়া'য় গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরি মহারাজ ছত্রপ্রদত্ত আটা ও ডাল গ্রহণ না করিয়া পর্ব্বত অধিবাসীর পবিত্র মাধুকরী অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দও তাঁহারই অনুগামী হইলেন। ছত্রের কর্ত্তারা লোক দ্বারা আটা ডাল পাঠাইয়া দিলেও তাঁহারা তাহা কখনও গ্রহণ করিতেন না। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ হরি মহারাজের সেবা, পবিত্র সঙ্গলাভ ও তপস্যাদিতে দিনগুলি কাটাইতে লাগিলেন। একদিন হরি মহারাজ গঙ্গার ধারে একটী পাথরের উপর

তাঁহার চাদরখানি ধুইতেছেন, আর স্বামী নিশ্চয়ানন্দও অপর একটী পাথরের উপর তাঁহার কাপড় ধুইতেছেন—এমন সময়ে হরি মহারাজের চাদরটী হঠাৎ গঙ্গায় পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় ঐ গেল!" স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হরি মহারাজ তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেও তিনি প্রবল স্রোতের মধ্যে পাথর হইতে পাথরের ধাক্কা খাইতে খাইতে চলিলেন। হঠাৎ স্রোতের একটী পাকের মধ্যে চাদরটী পড়িয়া ডুবিয়া গেল। তিনিও চাদরের সহিত ডুবিয়া গেলেন। ঐ পাকটী খুব গভীর ছিল। তিনি কতদূর যে নামিলেন, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাঁহাকে ও চাদরটীকে জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল। পরে কিছুদূর যাইয়া চাদর পাইয়া তিনি উপরে উঠিলেন। দেখিলেন শরীরে স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া গিয়াছে ও রক্ত পড়িতেছে। চাদরটী হরি মহারাজকে দিলেন। হরি মহারাজ তাঁহার সেই মূর্খের মত কার্য্যের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন

ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি ঐ সামান্য জিনিষটার জন্য জীবন দিতে গিছ্‌লে?" তিনি বলিলেন "আপনি কেন বল্‌লেন, 'নিশ্চয় ঐ গেল!'—আমি থাক্‌তে আপনার চাদরটী যাবে—তা কখনই হবে না।" হরি মহারাজ নিজের 'কুটীয়া'য় ফিরিয়া যাইলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ রক্তধারা বন্ধ করিবার নিমিত্ত ও যাহাতে হরি মহারাজ জানিতে না পারেন—পাছে তাঁর মনে কষ্ট হয়, তাহার জন্য গঙ্গার মাটী ক্ষতস্থানসমূহে চাপা দিতে লাগিলেন। পরে স্নানাদি সারিয়া নিজ স্থানে আসিলেন। পরদিন সর্ব্বাঙ্গে খুব বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু হরি মহারাজকে কিছুই বলেন নাই।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দের মধ্যে কিরূপ সদ্ভাব ও প্রণয় ছিল, তাহা বিশেষরূপে দেখিবার বিষয়। গুরু ভ্রাতাদের মধ্যে এইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অন্তরের টান অতি বিরল। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ত্রিদিবে অশ্বিনীকুমার নামে (রোমীয়রা যাঁহাদের Castor এবং Pollux

বলেন) যুগ্ম দেববৈদ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় প্রণয় ছিল। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দকে দেখিলে ত্রিদিব-আলয়বাসী এই অশ্বিনীকুমারের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়; কারণ, এই দুই সন্ন্যাসী মহা স্বার্থত্যাগী ও জীব-সেবায় সমস্ত জীবন একত্র অতিবাহিত করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের অশ্বিনীকুমারের সহিত তুলনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মধ্যে আর একটী বিশেষ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা একটী বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ধর্ম্ম-সমাজে দেখিতে পাই, কোন কোন ব্যক্তি ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং কোন কোন ব্যক্তি ভক্ত অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভাব অবলম্বন করেন—তাঁহারা প্রথম অবস্থায় বড় কষ্ট পাইয়া থাকেন। ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাদের নানারূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। তাঁহাদের পথ অতীব দুর্গম ও কষ্টকর। অবশেষে এই ভাব যখন পরিপুষ্ট ও প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন তাঁহারা কৃতকার্য্য বা

বিজয়ী হন। জগৎ তখন তাঁহাদের সেই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ভক্ত লইয়া থাকিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। নিজভাব জীবনে প্রতিফলিত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বশ্রুত কতকগুলি সাধুবচন ভক্তমণ্ডলীর নিকট তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন এবং সর্ব্বদা সেই কয়েকটি কথারই আলোচনা করেন। এইরূপ করায়, অনেক সময় তাঁহাদের মধ্যে উদার ভাব না আসিয়া —সঙ্কীর্ণ ভাবই আসিয়া থাকে। ফলে তাঁহাদের গোষ্ঠীর ভিতর যাঁহারা না আসেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহারা কটাক্ষপাত করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তদিগের মনস্তুষ্টির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে, সাধনার কঠোর পথ দিয়া নিজ অভীপ্সিত আদর্শে পৌঁছাইতে চেষ্টা করেন—সঙ্কীর্ণভাব সহজে তাঁহাদের হৃদয়ে আশ্রয় লইতে পারে না—তাঁহাদের এই ভাব-সাধনা সাধারণের মধ্যে বিশাল ভাবই আনয়ন করে। ভাবপন্থী এই সাধকগণের তেজোবীর্য্যপূর্ণ সাধনা সাধারণের হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয়, অনন্ত উৎসাহ

ও অনন্ত প্রেরণা আনিয়া দিয়া থাকে। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দ উভয়েই এই ভাবপন্থী।

আর একটী কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য —গুরুভক্তি ও গুরুর আদেশ পালনে প্রভেদ কি? বহু সংখ্যক লোক গুরুভক্তি করিয়া থাকেন। গুরুর নাম করিলেন, ভজন গাহিলেন, কিছু জপ-ধ্যান করিলেন, গুরুর প্রতিকৃতির উপর ফুল চন্দন দিলেন এবং দু' এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিলেন—ইহাই তাঁহাদের নিকট গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জগতে যে কয়েক ব্যক্তি তাঁহাদের এই নিদর্শন অনুযায়ী গুরুকে শ্রদ্ধা করেন এবং গুরুভক্তি বিষয়ে ঠিক তাঁহাদের মতাবলম্বী হইতে পারেন, সেই কয়েক ব্যক্তিরই জগতে বাস করিবার অধিকার আছে এবং তাঁহারাই মনুষ্যপদবাচ্য; আর যাঁহারা গুরুকে তদ্রূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবেন না এবং তাঁহাদের মতানুযায়ী ও ভাব অনুযায়ী কার্য্য করিবেন না তাঁহাদের জগতে থাকিবার কোন অধিকার নাই—সত্বর নরক গমনই তাঁহাদের অধিকার—ইহাই

এই সকল ব্যক্তির মনোভাব। বলা বাহুল্য, ইহা গুরুভক্তির নিকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ভাব। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে গোঁড়া—Bigot বা Fanatic বলা যাইতে পারে।

অপরদিকে আদেশ-পালনকারী ব্যক্তিরা মুখে এইরূপ হৈ চৈ করেন না—তাঁহারা অ-রব কর্ম্মী। গুরুর আদেশ উপলব্ধি ও পালন করিতে তাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে মনে প্রাণে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। গুরুর আদেশ কি করিয়া নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারা যায় এবং কি করিয়া জগতে গুরুর আদেশমত কার্য্য করা সম্ভবপর হয় তাহাই অ-রব ভাষায় তাঁহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন। গুরুর আদেশ অনুযায়ী নিজেদের সমস্ত জীবন গঠিত ও পরিচালিত করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন; কারণ গুরুর আদেশ গুরু সদৃশ—তাহাই সত্য বাণী। এইজন্য তাঁহারা মুখে গুরুভক্তির কথা বলেন না—মহা কর্ম্মজীবনেই তাঁহাদের গুরুভক্তি প্রকাশ পায়।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে তাঁহার গুরুদেব বলিয়া-

ছিলেন, "যদি বড় কাজ কিছু না কর্‌তে পারো অন্ততঃ এক পয়সায় একটা মাটীর কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে থেকে তৃষ্ণাতুর পথিকদের জলপান করাবে, তাতেও কিছু কাজ হবে।" এই আদেশ হইতেই কন্‌খলের এই বিরাট সেবাশ্রমের উৎপত্তি। নফর কুণ্ডুকে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় জীবসেবা করিতে বলিয়াছিলেন। নফর কুণ্ডুও তাহাই করিয়াছিলেন—দুইটী ধাঙ্গড়ের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নির্ভীক চিত্তে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—মুখে তিনি গুরুভক্তির ভাব দেখান নাই। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দও এইরূপ ভাবে গুরুর আদেশ-পালনে সর্ব্ব জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। গুরুভক্তি অপেক্ষা গুরুর আদেশ-পালন যে শ্রেষ্ঠতর কার্য্য —তাহাই তাঁহারা জীবনে দেখাইয়াছেন। গুরুর আদেশ-পালনের ফলে গুরুর স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ এই মহান্ প্রতিষ্ঠান কন্‌খলের রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে বিরাজ করিতেছে।

এখানে একটী ঘটনার বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি। এক সময় কোন এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কন্‌খল সেবাশ্রমে গিয়া বাস করেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহাকে বয়সে বড় ও প্রবীণ বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। একদিন এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে 'ডিস্পেনসারী' ঘরের দিকে লইয়া যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই সব ডাক্তারখানা, হাঁসপাতাল ক'রে কি ফল আছে? সাধন-ভজন ও তপস্যাই একমাত্র উপায়। তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) বল্‌তেন, 'ভগবান লাভ হ'লে তুমি কি বল্‌বে যে এত ডাক্তারখানা করেছি—হাঁসপাতাল করেছি?' সাধন-ভজন ক'রে ভগবান লাভ করাই হ'ল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য"। এইরূপ নানা কথায় তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কর্ম্মী; সারা জীবনপাত করিয়া অসুস্থদিগের সেবার জন্য কন্‌খলের জঙ্গলের ভিতর সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কথায় তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল এবং তিনি মনে মনে একটু বিরক্তও হইয়াছিলেন।

ছিলেন, "যদি বড় কাজ কিছু না কর্‌তে পারো অন্ততঃ এক পয়সায় একটা মাটীর কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে থেকে তৃষ্ণাতুর পথিকদের জলপান করাবে, তাতেও কিছু কাজ হবে।" এই আদেশ হইতেই কন্‌খলের এই বিরাট সেবাশ্রমের উৎপত্তি। নফর কুণ্ডুকে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় জীবসেবা করিতে বলিয়াছিলেন। নফর কুণ্ডুও তাহাই করিয়াছিলেন—দুইটী ধাঙ্গড়ের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নির্ভীক চিত্তে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—মুখে তিনি গুরুভক্তির ভাব দেখান নাই। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দও এইরূপ ভাবে গুরুর আদেশ-পালনে সর্ব্ব জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। গুরুভক্তি অপেক্ষা গুরুর আদেশ-পালন যে শ্রেষ্ঠতর কার্য্য —তাহাই তাঁহারা জীবনে দেখাইয়াছেন। গুরুর আদেশ-পালনের ফলে গুরুর স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ এই মহান্ প্রতিষ্ঠান কন্‌খলের রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে বিরাজ করিতেছে।

এখানে একটী ঘটনার বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি। এক সময় কোন এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কন্‌খল সেবাশ্রমে গিয়া বাস করেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহাকে বয়সে বড় ও প্রবীণ বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। একদিন এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে 'ডিস্পেনসারী' ঘরের দিকে লইয়া যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই সব ডাক্তারখানা, হাঁসপাতাল ক'রে কি ফল আছে? সাধন-ভজন ও তপস্যাই একমাত্র উপায়। তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন, 'ভগবান লাভ হ'লে তুমি কি বলবে যে এত ডাক্তারখানা করেছি—হাঁসপাতাল করেছি?' সাধন-ভজন ক'রে ভগবান লাভ করাই হ'ল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য"। এইরূপ নানা কথায় তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কর্ম্মী; সারা জীবনপাত করিয়া অসুস্থদিগের সেবার জন্য কনখলের জঙ্গলের ভিতর সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কথায় তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল এবং তিনি মনে মনে একটু বিরক্তও হইয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে রামকৃষ্ণ মিশনের ভিতর, চলিত ধারানুযায়ী যাহাকে সাধন ভজন বলা হইয়া থাকে তাহা ব্যতীত অন্যবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে কিনা? সিষ্টার নিবেদিতা একবার অতি গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "Ramkrishna represents India five thousand years old, Vivekananda represents India three thousand years to come." অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত ভারতে যে সকল ভাব উদ্ভূত হইয়াছিল—যাহা প্রাচীন ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাব ও সম্পদ বলিয়া পরিগণিত—প্রাচীন ভারতীয় শীল্প (culture) বলিতে যাহা বুঝায়—সে সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি হইতেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আর ভবিষ্যৎ ভারত—যে ভারত পৃথিবীর সকল জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ভাবের সঞ্চালন করিয়া ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে—সেই নব ভারত কিরূপ হইবে তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে,

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাব—যাহা অল্প সংখ্যক ব্যক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল ও এইজন্য মন্থর গতিতে চলিতেছিল, সেই অসীম ভাবরাশির সমুদ্রকে বিভিন্ন পয়ঃপ্রণালী ও প্রবাহে নানাভাবে, নানারূপে সংযোগ করায় বহুধা পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। মন্থর গতি হইতে দ্রুত গতি আসিল এবং প্রত্যেক পয়ঃপ্রণালী ও প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন নাম লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে পরিণত হইয়া নব রূপ ধারণ করিল। স্বামিজীর তীব্রভাব, দ্রুতগতি ভাব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রশান্ত মন্থরগতি ভাবের কোনই পার্থক্য নাই। সিষ্টার নিবেদিতার কথা অতীব সত্য—এবিষয়ে কোন তর্কই চলিতে পারে না।

ভারতের যাহা শাশ্বত বা সনাতন ভাব, যাহা উপনিষদাদিতে পাওয়া যায়—তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। সেই সকল ভাবের পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়—করা যাইতেও পারে না। কারণ, জাতির অস্থি-মজ্জায় এই সকল ভাব মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে—জাতির প্রাণ এই সকল ভাবের ভিতর নিহিত আছে। এই

সকল ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অপর ভাব প্রণয়ন করা প্রশস্ত নয় ; জাতি সেই সকল ভাব লইবে না। এই শাশ্বত বা সনাতন প্রাচীন ভারতীয় ভাব বজায় রাখিয়া নূতন ভাবের প্রণয়ন ও অভ্যুত্থান করিতে হইবে ; কারণ, কাল ও অবস্থাদির এখন বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন কোন জাতিই বিশ্লিষ্ট ও অসংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না এবং সেইরূপ থাকাও অবিধেয়। এখন সকল জাতিই জগতের অপর সকল জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে বাধ্য। বাণিজ্য, ভাষা, বিদ্যাচর্চ্চা, রাষ্ট্রনীতি, ইত্যাদি বহুপ্রকারে এক জাতি পৃথিবীর অপর সকল জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য প্রাচীন ভাব সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা এবং প্রাচীনরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। প্রাচীন বা শাশ্বত ভাব থাকিবে, কিন্তু তাহার সমস্ত প্রক্রিয়া ও বিকাশ ক্ষেত্র কালোপযোগী করিয়া অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। "নিত্য নব ভাবের উদয়" ; কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, সে বিষয়ে কোনই ব্যতিক্রম

করা চলিবে না; কারণ তিনিই এই যুগের অধিনায়ক।

এক শ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন যে, যাহা কিছু চিন্তা করিবার বিষয় ছিল প্রাচীন কালে সে সকলই চিন্তিত হইয়াছে; কারণ, প্রাচীন ব্যক্তিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন—তাঁহাদের চিন্তিত বিষয়ের বাহিরে আর নূতন কোনও চিন্তা থাকিতে পারে না। নূতন কোন প্রকার চিন্তা করা বা ভাব উদ্ভাবন করা ইহাদিগের মতে ভ্রমাত্মক ও প্রমাদপূর্ণ এবং গর্হিত পাপ। কিন্তু কোন জাতির চিন্তাশক্তি কখনও একক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি কোনও জাতি তাহার চিন্তাশক্তি একক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে—অল্পদিনের মধ্যে জাতীয় ভাবসমূহের ভিতর পূতিগন্ধ আসিবে এবং অচিরে জাতির মৃত্যু হইবে। জনসমূহ থাকিবে, কিন্তু তেজস্বী ভাব, প্রাণশক্তিসঞ্চারণ-কারী যে সকল ভাব জাতিত্বের পরিচায়ক—সে সকল ভাব আর থাকিবে না—দেশে হীন মৃতকল্প জনসমূহ বাস করিবে। এইজন্য স্বামিজী পুনঃ

পুনঃ বলিয়াছেন, "নূতন শক্তি, নূতন ভাব উদ্ভাবন করো, নূতন ওজস্বিতায় কার্য্য করো। মৃত পূতিগন্ধ শব হয়ে থেকো না—জীবন্ত শক্তিমান্ পুরুষ হও।"

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনমার্গের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। স্বামিজীর পূর্ব্বে ভারতের ভাব ছিল নিষ্ক্রিয় ত্যাগ বৈরাগ্য। নিষ্ক্রিয় ত্যাগ হইল—জগৎ হইতে সকল প্রকারে নির্লিপ্ত হইয়া সাধন-ভজন করা ও ব্রহ্মতে একেবারে চিত্ত লয় করা। ইহা অতি উচ্চ মার্গের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল ব্যক্তির পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নহে। জগতে এমন খুব অল্পই সত্ত্বগুণী ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। অধিক স্থলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে সত্ত্বগুণের ভাবের ভাণ করিয়া অনেকে জড়ত্বে পৌঁছাইয়া থাকেন। জাতির ভিতর এই ভুয়ো সত্ত্বগুণের প্রাধান্য দেখিয়া স্বামিজী বলিতেন, "তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ শ্রেষ্ঠ। আগে জাতের রজোগুণ আসুক, পরে

সত্ত্বগুণ আস্‌বে — এখন জাতটা তমোগুণে—জড়ত্বে ডুবে রয়েছে।" এই জড়ত্বের ভাব বিদূরিত করিবার জন্য মহাশক্তিমান্ ও ধীমান্ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কালভেদী দৃষ্টিতে যুগ-প্রয়োজন বুঝিয়া এই প্রাচীন নিষ্ক্রিয় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবটীর কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিলেন। তিনি সক্রিয় ত্যাগ ও সক্রিয় বৈরাগ্যের বাণী শুনাইলেন। তিনি তাঁহার অন্তেবাসীদিগের ভিতর এই ভাব প্রবোধিত করিলেন। অনেক পত্রে, অনেক উপদেশেতে দেখা যায় যে তিনি এই সক্রিয় ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাবটী তাঁহার গুরু ভাইদের ভিতর, শিষ্যদিগের ভিতর এবং জাতির ভিতর প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভগবান বুদ্ধেরও সক্রিয় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব ছিল—তাঁহার বাণী ছিল,—'বহুজন হিতায়' ও 'বহুজন সুখায়'। বহুকাল পরে বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক সেই ভাব প্রণোদন করিলেন। তিনিও সক্রিয় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব প্রচার করিলেন। তাঁহার বাণী হইল, 'শিব-জ্ঞানে

জীবসেবা।' ভগবান বুদ্ধের জীবন, কার্য্যকলাপ ও প্রচেষ্টার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, কার্য্য-কলাপ ও প্রচেষ্টা ইত্যাদির তুলনা করিলে উভয়ের ভিতর বহু সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক দিক দিয়া দেখিতে যাইলে বেশ স্পট বুঝা যায় যে, ভগবান বুদ্ধের পর স্বামী বিবেকানন্দই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি সেইরূপ উদার ভাব প্রসারণ করিয়াছেন। যদিও এই দুই মহাপুরুষের জন্মকালমধ্যে ভারতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষাত্রশক্তি প্রসাধনকারী এই দুই মহাপুরুষের সহিত তাঁহাদের অনেক পার্থক্য আছে। দেখিতে পাই, ভগবান বুদ্ধ যেমন গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, কমণ্ডলু হস্তে, মুণ্ডিত মস্তকে, স্থির নেত্রে, ধীর গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন, "জাতির পুরাতন ভাব আমি সম্মান করিব, নিস্তেজ ভাব, সঙ্কীর্ণ ভাব, রোচ্যমান ভাব আমি সমূলে উৎখাত করিব—তেজঃপূর্ণ, জ্ঞানপূর্ণ ক্ষাত্রশক্তি সংযোগ করিয়া মুমূর্ষু ভাবরাশিকে সঞ্জীব করিব। শিক্ষা, সমাজ-তন্ত্র, শীল্প ইত্যাদি যত প্রকার মানব-হৃদয়ের প্রচেষ্টা

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আছে—সে সমস্তই আমি পুনরায় গঠন করিব। আজ হইতে আমি জগতের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম।" ভগবান বুদ্ধের এই বিশ্বনাদ বহুকাল-ব্যাপী জাতিকে আলোড়িত করিয়াছে এবং জাতি ও মানবসমাজে নূতন সভ্যতা, নূতন শীল্প প্রণোদিত করিয়াছে। দেখিতে পাই, বহু শতাব্দী (২৫০০ বৎসর) পরে স্বামী বিবেকানন্দও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, মুণ্ডিত মস্তকে, দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে জগতকে সেই নির্ভীক বাণী শুনাইতেছেন, "আমি প্রাচীন ভাবকে সম্মান করিব, কিন্তু মুমূর্ষু, রোরুদ্য-মান ভাব, সঙ্কীর্ণ ভাব, হীন ভাব সমূলে উৎখাত করিব—I want root and branch reform —আমি ডাল পালা শিকড় পর্য্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিব—নূতন ভারত—নূতন জগৎ সৃষ্টি করিব—আজ হইতে আমি সমস্ত জগতের ভার গ্রহণ করিলাম।"

গ্রন্থে অনেক ভাবের উল্লেখ আছে। অনেক ধর্ম্মবাণীর কথা আছে। এই সকল ভাব, এই সকল বাণী কয়েকটী ব্যক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল

এবং সাধারণের বোধগম্য ছিল না — আর জানিবার অধিকারও ছিল না। যাঁহাদের এই সকল ভাব ও ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয় জানিবার অধিকার ছিল বা যাঁহারা এই সকল তত্ত্বের সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের সকলেই ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, জগতের কি হইল বা না হইল তাহার বিষয় কোন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধ করেন নাই। সাধু হইলে দীর্ঘ জটাজূট, গায়ে বিভূতি, গলায় বড় রুদ্রাক্ষের মালা ও হাতে চিমটা থাকিবে। তিনি প্রজ্জ্বলিত ধুনির সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিবেন ও সঙ্গে শিষ্য থাকিবে। মৃত্যুর পর কি হইবে তাহাই তিনি চিন্তা করিবেন। জীবিত অবস্থায় কি হইতেছে তাহার কোন খোঁজই রাখিবেন না। জীবিত মানুষটা মরিল কি বাঁচিল সে বিষয়ে চিন্তা করিবার কিছু আবশ্যক নাই।" আপন অদৃষ্টফল ভোগ কর্‌তা হৈ"—এইরূপ বচন আওড়ানোই তাঁহাদের গুরুগিরির বাধ্য। "জগৎ ত্রিকালমে হোতা নহী, হুয়া নহী, হোগা নহী, হোনেকা সম্ভবভী নহী হৈ। দাল রুটী খাও ঔর মৌজমে বৈঠ রহো"—এই হইল পূর্ব্বকার

সাধুদের গুরুগিরির বচন। অদ্বৈতবাদ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সেই জন্য তাঁহার পদানুগ ষ্টার্ডিকে সর্ব্বদাই বলিতেন,—"Make it a common property of mankind. Don't keep it cooped up in a corner"—অদ্বৈতবাদ—বেদান্তবাদ জগৎশুদ্ধ প্রচার কর—একটা কোণে আট্‌কে রেখো না।' পুরাতনপন্থীরা এই সকল উচ্চভাব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর রাখিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ সেই উচ্চ ভাব-সমূহকে ক্ষাত্রশক্তি সংযোগ করিয়া জগদ্ব্যাপী প্রসারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেব আপন শিষ্যদিগকে ভারতের বহির্দ্দেশে যাইতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দেশে ভারতীয় ভাবের প্রসারণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও সেইরূপ ভারতের বহির্দ্দেশে ভারতীয় ভাব প্রচার করিতে, ভাবের বিনিময় করিতে স্বয়ং তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং নিজ গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদিগকে এই কার্য্যে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের বাণী ছিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দও এইরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের বাণী মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন। একের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নীরবে কার্য্য করিবার আদর্শই রামকৃষ্ণ মিশনের কৃতকার্য্যতার গূঢ় কারণ। রামকৃষ্ণ মিশনের এই সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়ার আদর্শ দেশের জনসাধারণ গ্রহণ করিয়াছে।

ভগবান বুদ্ধের জীবনে আর একটী বিশেষ ভাব দেখা যায়—আত্মসম্বুদ্ধ ভাব (Self-assertive)। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়ার পিছনেও আছে স্বামিজী কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ আত্মসম্বুদ্ধ ভাব। হীন, মৃতকল্প, রোরুদ্যমান ভাব রামকৃষ্ণ মিশনের নহে। রামকৃষ্ণ মিশন জগতের সম্মুখে আত্মসম্বুদ্ধ ভাবটী বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেছেন। নূতন ভারত এই আত্মসম্বুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিয়াছে এবং এই ভাব গ্রহণের জন্য ভারত কল্যাণের পথে জয়যাত্রা করিবে।

স্বামিজী প্রণোদিত রামকৃষ্ণ মিশন কতকগুলি পূজারী ও ভক্ত তৈয়ারী করিবার জন্য হয় নাই। স্বামিজী ঘণ্টা নাড়া, প্রদীপ ঘুরান, চন্দন বাটা একেবারে ত্যাগ করেন নাই—এ সকলেরও আবশ্যক আছে। কিরূপে জগতের মঙ্গল হইবে, কোন্ কোন্ ভাবের দ্বারা—কোন্ কোন্ বিদ্যার ভিতর দিয়া জগতকে উত্তোলন করা যাইতে পারে—ইহাই হইল রামকৃষ্ণমিশনের চিন্তা। একঘেঁয়েমীর স্থান রামকৃষ্ণ মিশনে নাই। পূজনীয় হরি মহারাজ অনেকবার আক্ষেপ করিয়া অতি কাতর ও ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী অতি কাতর ভাবে বিশেষ ক'রে নিষেধ করেছিলেন,—'মঠকে বাবাজীর আখড়া কোরো না'।" স্বামিজীর এক মহতী ইচ্ছা ছিল যে, মঠকে একটী শীল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থান—বিদ্যাপীঠ স্বরূপ করিবেন। যাহাতে বৌদ্ধযুগের নালান্দা ও তক্ষশীলার পুনরায় অভ্যুত্থান হইতে পারে, সেজন্য তিনি নিজ বহুমুখী প্রতিভা ও বিদ্যার দ্বারা নানা উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। স্বামিজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, কর্ম্মকুশলতা ইত্যাদি বিষয়ের

নূতন ভাবে প্রচলনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষা, সমাজতন্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, কাব্যরচনা, প্রতিমা নির্ম্মাণ, চিত্রকলা, সঙ্গীত-বিদ্যা, স্থাপত্য, ব্যায়াম চর্চ্চা ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে নূতন ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া নিজ শিষ্যগণের মধ্যে তাহা প্রণোদিত করিতেন। বহির্জগতের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য তিনি মঠে অনেক ইংরাজ, আমেরিকান ও জাপানীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বামিজী প্রদর্শিত এই ভাব-বিনিময়ের পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভাবের প্রসারণ ও পরিগ্রহণ হইবে। একদিকে ইহাতে যেরূপ ভিন্ন জাতির ভিতর ভারতীয় ভাবের প্রসারণ হইবে—অপর দিকে সেইরূপ বিভিন্ন জাতির ভাব উপযোগী করিয়া লওয়া সম্ভবপর হইবে। দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহকোণে বসিয়া কাঁদিলে চলিবে না—নির্ভীক হইয়া অপরকে নিজেদের ভিতর লইতে হইবে; তাহা হইলে সমস্ত জগতের সহিত একটা সামঞ্জস্য আসিবে। রামকৃষ্ণ মিশনের উপর স্বামিজীর আশীর্ব্বাদের সহিত তাঁহার এই মহতী ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

রামকৃষ্ণ মিশনের উপর শুধু ভারতের নয়—সমস্ত জগতের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। হৃদয় ও মস্তিষ্কই হইল এই ভারগ্রহণের উপকরণ।

রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবদেহের প্রতীকস্বরূপ। স্বামিজীর মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কার্য্য করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যক্ষেত্র শুধু দেশের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নাই—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ তাহা পরিব্যাপ্ত—বসুধার সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের আপনার জন। "নানা সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মত সকলকে কি ক'রে একসূত্রে গ্রথিত করা যেতে পারে?"—শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "সেবাভাব দিয়ে সকলকে একীভূত করা যেতে পারে।" মহাপুরুষের এই দূরদৃষ্টিপূর্ণ বাণী কখনও অসত্য হইবার নহে। সমন্বয়বার্ত্তাবহনকারী রামকৃষ্ণ মিশন 'বহুরূপী' ভগবানের বহুরূপে সেবা করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে যে শ্রদ্ধা, প্রেম ও প্রীতি-ভালবাসা দৃঢ়সূত্রে একত্র গ্রথিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন—

কালে তাহা জগতের চিন্তা ও ভাবধারা পরিবর্ত্তন করিয়া মহাশান্তি আনয়ন করিবে। সেই মহামিলন —মহাশান্তির দিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পদানুগ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীদের অতি উচ্চ সম্মান দিতে হইবে। জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রণয়ন কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগকে একটী বিশেষ স্থান দিতে হইবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

শিব ওঁ

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী :—

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড।

" " " ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)।

স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী
(তিন খণ্ডে সমাপ্ত)।

সাধু চতুষ্টয়।

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান।

বৃহন্নলা।

Dissertation on Painting.

Reflections on Woman.

Metaphysics.

Mind.

Energy.

Natural Religion.

Appreciation of Michael and Dinabandhu.

Principles of Architecture.

Kurukshetra
(An Epic — in the Press).

LIBRARY
No.....
[illegible] Ashram
BANARAS